Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 264 - 271
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

গণসংগীত ও সলিল চৌধুরী : এক সামগ্রিক পর্যালোচনা

শতাব্দী ধন
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
Email ID: dhanshatabdi96@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Struggle, Protest, Movement, Strike, People's theatre, Nationalism, Inspiration, Communist Party, New form, Mass song.

Abstract
The relationship between Indian People's Theatre Association and muss music is inextricably related. In the 40s when the political situation in Bengal was not normal at all, has made the daily life and livelihood of common people miserable. In that social and political situation the Indian People's Theatre Association was formed to reawaken and build the consciousness of all the people culturally. However, this Indian People's Theatre Association not formed in one day. The Communist Party of India laid the ground work for the establishment of it. In the bulletin of the I.P.T.A has repeatedly started that any intellectual artist, writer who wants to speak about the people can join. I.P.T.A has largely functioned as the cultural wing of the Communist Party. I.P.T.A was born in 1943. The poor farmers, labourers, day labourers somehow made a living. I.P.T.A broke the So Called drama barrier and come out and brought revaluation. 'I.P.T.A stars the people — this was stated at the very beginning of the first bulletin (July, 1943) of I.P.T.A. this bulletin explains the socio-political situation of company at the time under the name of 'Historical background'. The bulletin clearly states; the I.P.T.A has taken responsibility because the country's theatre has not kept pace with the mentality of the times. I.P.T.A has thought of presenting new and stimulating subjects through the old and traditional medium of folk art. Therefore, by accepting the cultural heritage of our country, we should show todays problems through it, and find way to solve it. Like the I.P.T.A about their production, it will be 'simple' and 'direct'. So that the common people can easily understand and themselves can come

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

forward enthusiastically in new theatre production. By following this path, I.P.T. A's success comes gradually.

In a very short time, the new form of music come by holding the hands of I.P.T.A whose purpose of writing or singing is to speak out against injustice. The subject name of the new form of music is 'Mass Music'. It is not that the song of struggle, the song of protest did not exists in Bengali language before, but it must be admitted that the name of muss music would never have been established and known if I.P.T.A was not formed. How the mass music has become an extraordinary art form in the political and social conditions, would have remained unknown to us. Binay Ray used to train all the introductory phase of the I.P.T.A and mass music. Salil Chowdhury, Debabrata Biswas, Jyotirindra Moitra, Hemanta Mukhopadhyay, Hemanga Biswas, Suchitra Mitra etc were beside Binay Ray. Hemanga Biswas reinvented mass music in the form of folk music. Gurudas Pal, Ramesh Shit, Nibaran Pandit expressed their pain of life through music. Not being people of West Bengal, Bhupen Hazarika popularized mass musician among the Bengalies of West Bengal. Salil Chowdhury wrote and composed his songs of mass consciousness. He did various experiments on his mass music. He pioneered a new song theme, form and style of mass music. In this way, mass music and Salil Chowdhury became an inseparable part.

Discussion

সলিল চৌধুরীর গণসংগীতের আলোচনার পূর্বে আমরা 'গণসংগীত' বলতে কী বোঝায় তা একটু দেখে নেব। এই 'গণসংগীত' ঠিক কী তা নিয়ে বিশিষ্ট জনেদের বিভিন্ন মতামত আছে। রত্না ভট্টাচার্যের মতে,

> "আধুনিক শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের গানই গণসংগীত।"[১] দিলীপ সেনগুপ্তের মতে, "মূলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের উপাদান নিয়ে সৃষ্ট গানকেই আমরা গণসংগীত বলে থাকি।"[২]

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বক্তব্য,

> "স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সাগরে মিশেছে, সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম।"[৩]

এই সমস্ত মতামতকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা গণসংগীত সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা পাই— অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হল এই গণসংগীতের প্রধান বিশেষত্ব। দুর্বল, ক্ষমতাহীন মানুষদের ওপর ক্ষমতাশালী মানুষদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ। অবশ্য শুধুমাত্র এই প্রতিবাদের ওপরই গণসংগীতের ব্যাখ্যা শেষ করা যায় না। নিরন্তর এক সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এমন এক নতুন দিন আসবে, যেদিন এই অপমান, অবহেলা, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অন্যায়ের সুযোগ ক্ষমতাশালীরা পাবেনা। এই ধরনের এক আশার আলোর সন্ধান দেয় 'গণসংগীত'। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে যেহেতু দুর্বলকে শোষণ করা হয়, তাই কোথাও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাও 'গণসংগীত'-র উদ্দেশ্য। এই সংগীত কোনো স্থানিক, কালিক বেড়াতে আবদ্ধ থাকে না। সমগ্র বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে শোষক-শোষিতের লড়াই চলছে, সেই লড়াইয়ের

চরিত্র সর্বত্র এক বলেই, সেই লড়াইগুলি থেকে উঠে আসা গান কোনো নির্দিষ্ট দেশের, কালের নয়। এই গণসংগীত হল কালোত্তীর্ণ, আন্তর্জাতিক।

আমাদের ভারতবর্ষেই যে প্রথম গণসংগীতের সূচনা হয়েছে তা নয়। আমাদের পূর্বে অন্যান্য দেশগুলিতে এই সংগীতের সূচনা হয়ে গেছে। যে সমস্ত দেশে বিপ্লব এসেছে সেই সব দেশে গণসংগীত ধ্বনিত হয়েছে, লিখিত হয়েছে। ধর্ম, জাতি, বর্ণভিত্তিক যে নিপীড়ন মানুষের উপর চালানো হয়, তার বিরুদ্ধে পল্ রোপসনের আত্মজীবনীতে কণ্ঠস্বর সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছে—

> "আর কতদিন, হে ঈশ্বর, আর কতদিন? নিপীড়িত মানুষের সেই বহু যুগের আর্তনাদ আজকাল প্রায়ই নিগ্রো কাগজে প্রতিধ্বনিত হয়, যার পাতায় পাতায় থাকে আমাদের উপর নানান আক্রমণের খবর ও ছবি। একটি ছবিতে একজন নিগ্রোকে শ্বেতাঙ্গ লাথি মারছে আর সঙ্গে সঙ্গে আঘাতটা পাঠকের বুকে এসে লাগে। এছাড়া আরও ভয়ংকর ছবি থাকে— জ্বলন্ত ক্রুশ, প্রহৃত পুরোহিত, বোঝায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, শিশুদের প্রতি হুমকি, হাত-পা ভাঙ্গা মানুষ, কারারুদ্ধ মা, অবরুদ্ধ পরিবার—এ সবই বলে দেয় কী চলছে চারপাশে।
>
> কতদিন কত দিন? উত্তর : যতদিন আমরা সয়ে যাব। আমি বলি নিগ্রোদের আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে, আমি বলি এই সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং সারাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা আনার ক্ষমতা আমাদের আছে। এ ঘটনা স্বীকার করলেই আমাদের কর্মসূচি পরিকল্পনায় নতুন শক্তি, বলিষ্ঠতা ও সংকল্প আসবে, লক্ষ্যপূরণে আসবে নতুন জঙ্গি ভাব।"[৪]

এই আত্মবিশ্বাস, আত্মজাগরণের কথা কমল সরকার বাংলা ভাষায় গানে রূপ দেন— "ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না/ নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন/ আমরা আমাদের গান গাই, ওরা চায় না, চায় না/... ওরা বিপ্লবের ডুমরুতে ভয় পেয়েছে- রোবসন/ নিগ্রো ভাই আমার পল্ রোবসন..."[৫] এটি একটি গণসংগীত। এই গানটি আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। পল্ রোবসনের পরে তাঁরই পথের অনুসরণ করেছেন পিঠ সিগার, বব ডিলান, জোয়ান বায়েজ প্রমুখরা। বাংলা গণসংগীতকারদের অনেকের কাছে এরা অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। পিট সিগারের গাওয়া সেই বিখ্যাত গান 'উই শ্যাল ওভারকাম' - এর হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বাংলাতে অনুবাদ করেছেন—'আমরা করব জয়'। বব ডিলান, জোয়ান বায়েজ প্রমুখেরা অনেকটাই পরে এসেছেন, গণসংগীতের ক্ষেত্রে রোবসন বা সিগারের প্রতিবাদের সুর বা পৃথিবীর সকল দেশের সমস্ত নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষ শুধুমাত্র এগুলিকে কেন্দ্র করেই বাংলা গণসংগীতের সৃষ্টি হয়নি। রাজনৈতিক, সামাজিক পটভূমিতে বাংলা ভাষাতে গণসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর চল্লিশের দশকের একদিকে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, মহামারী, সামাজিক বিধ্বস্ততা, বিভ্রান্তি, অসহায়তা তখন প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের মূলত প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে জ্বলজ্যান্ত বাস্তবকে নাটক ও অন্যান্য শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা। নাটকে, নাচে, গানে কবিতায় দুর্বলের দুঃখ-কষ্ট, তাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ছবি সামনে এনে মানুষের মুক্তি ও শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' সেই দিন থেকেই নিজের রূপ পেতে শুরু করে। ভারতীয় সংস্কৃতি শতবর্ষব্যাপী যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সুরে বাঁধা ছিল, সেখানে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে 'গণনাট্য আন্দোলন' নিয়ে আসে সর্বহারা জাতীয়তাবাদের প্রেরণা। বলা বাহুল্য, সমাজ সচেতন লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীর এক বিশেষ অংশের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী অংশের সহযোগিতার জন্যই বাস্তবে রূপ পায়। সেই শুরু গণনাট্যের অন্যতম সহযোগী হিসেবে গণসংগীতেরও পথ চলা। একেবারে গোড়াতেই গণসংগীতকে যে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া তার প্রমাণ, কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন 'গণনাট্য সংঘ' করেন, তার প্রধান অংশই ছিল বিনয় রায়ের নেতৃত্বে দশটি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে গণসংগীতের অনুষ্ঠান। এ রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনার ধারাবাহিকতা ও উত্তরাধিকার বহন করে পরপর দুটি দশক জুড়ে নিজের ভিতকে শক্ত করেছে গণসংগীত।

আমাদের বাংলা গানে গণসংগীত পূর্বেই ছিল যদিও সেই গানের ফর্মটা চল্লিশের দশকের মতো ছিল না। কিন্তু গানের মধ্যে ছিল বিদ্রোহী মনোভাব। এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকেই পুরোধা হিসেবে পাব। যেমন—'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' কিংবা 'বিপুল তরঙ্গ রে', 'মুক্তি তোরে পেতেই হবে', 'আকাশ হতে প্রভাত আমার পানে হাত বাড়ালো' গণনাট্যের মঞ্চে এই গানগুলো দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখেরা বহুবার গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকামী গানগুলির আগের থেকেই স্বদেশী গানের ধারা চলে আসছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন বসুর গানে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীতে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গানেও স্বদেশী গানের ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচিয়ে দেশের মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিতে হবে—এর ওপর ভিত্তি করেই গণসংগীতের সূচনা হয়। গণসংগীতের জগতে দুই দিকপাল সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস। বাংলা গণসংগীত মানুষের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কাজেই তাকে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজন নতুন ফর্ম, নতুন সুরের কাঠামো— এই ছিল সলিল চৌধুরীর মতামত। এর জন্য তিনি সাহায্য নেন পাশ্চাত্য সংগীতের। তাঁর গানগুলির সাংগীতিক ও সাহিত্য গুণের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট তাই তাঁর এই সংগীত তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। অবশ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের থেকে এই সাফল্য এসেছে। নিবারণ পণ্ডিত (কৃষকের ছেলে), গুরুদাস পাল (বিড়ি শ্রমিক) এনারাও প্রতিবাদের যে গান বাঁধতেন গেঁয়ো সুরে, কখনো চটকার সুরে, কখনো কবিগানের মতো, কখনো আবার বাউল গানের সুরে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসও চেয়েছিলেন লোকসঙ্গীতের সুরকে আশ্রয় করেই গান তৈরি করতে, যাতে গ্রামের মানুষের যন্ত্রণার কথা তাদেরই চেনা সুর বলে, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে আন্দোলনমুখী করে তোলা যায়।

এবার আমরা সলিল চৌধুরীর গণসংগীত রচনার প্রেক্ষাপট ও গণসংগীত নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করবার চেষ্টা করব।

সলিল চৌধুরীর বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন আসামের শিবসাগর জেলার লতাবাড়ি চা-বাগানের শ্রমিক শ্রেণীর ডাক্তার চা বাগানের ম্যানেজার অপমানজনক কথা বলায় সেখানে ডাক্তারি পেশা ছেড়ে সপরিবারে এসে পৈতৃক ভিটে দক্ষিণ বারাসাতে এসে ওঠেন। সেখানেই ডিসপেনসারি খোলেন। এই বারাসাতে থাকাকালীন বিদেশী বয়কটের উত্তেজনায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ দু'-তিন ট্রাংক ভরতি দামি সুট পুড়িয়ে ফেলেন। তখন তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন কুরুচিকর মন্তব্য রটনা হতে থাকে। এই ঘটনার জন্য সলিলবাবু তাঁর পরিবারের সঙ্গে পুনরায় আসামে ফিরে যান। শেষ পর্যন্ত কাজিরাঙাতেই স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চা শ্রমিকদের খুব ভালোবাসতেন। হাসি-ঠাট্টায় তাদের সবসময় জমিয়ে রাখতেন। তাদের নিয়ে নাটকও করেছিলেন। কাজেই চা-শ্রমিকদের প্রতি মমত্ববোধ বাবাকে দেখে সলিল চৌধুরীর জেগে ওঠে। বাবার থেকেই তাঁর গানের প্রতি ভালোবাসা, উৎসাহ পাওয়া।

তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'জীবন উজ্জীবন' তে জানিয়েছেন, লতাবাড়ি চা বাগান থেকে তড়িঘড়ি করে বারাসাত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে বহু জিনিস তাদের জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর বাবা একটা চোঙা দেওয়া কুকুর মার্কা কলের গান আর প্রায় একশোটার মতো রেকর্ড বিক্রি করেননি। সেই গানের রেকর্ডগুলি ছিল Bach, Beethoven, Mozart, Suhubert প্রমুখের। রাত্রি ন'টা বাজলেই তিনি রেকর্ডগুলো বাজাতেন। চা-বাগানের শ্রমিকদের নাটকের জন্যও সুর দিতেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। এইভাবে গান বিশেষত পাশ্চাত্য সংগীতের সুর সলিল চৌধুরীর গান শোনার কানকে তৈরি করে দেয়। এরপর সলিল চৌধুরী দাদার সঙ্গে ১৯৩৩ সালে কলকাতাতে এসে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে আসেন। তাঁর জ্যোঠতুতো দাদা নিখিল চৌধুরী ছিলেন সংগীত পরিচালক। আর ওই বাড়িতেই আসর বসত অর্কেস্ট্রা দলের। এই দলটির নাম ছিল 'মিলন পরিষদ'। এইভাবেই পিয়ানো, তবলা, বাঁশি, বেহালা, এসরাজ, সেতার, গিটার শেখার হাতেখড়ি হয়। এই বাদ্যযন্ত্র শেখা অবশ্য তাঁর বেশিদিন হয়নি। এক বছরের মধ্যেই দুইভাই (সলিল ও সুনীল) মামারবাড়ি দক্ষিণ কলকাতার কোদালিয়া গ্রামে চলে যান। তাঁদের এই মামারবাড়ি থেকে হরিনাভি অ্যাংলো-সংস্কৃতি স্কুলে যাবার পথে পড়ত একটা মেথরপল্লী। দীর্ঘদিন ধরে তাদের প্রতি হওয়া অসম্মান, অনাচার ও সামাজিক নিগ্রহের বিরোধিতা করে সেখানকার মেথররা একদিন স্ট্রাইক করে। সেদিন মেথরদের ওপর হওয়া নির্যাতন প্রভৃতিকে যেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন ও কমিউনিজমের সঙ্গেও যুক্ত হন। এইভাবেই তাঁর রাজনীতিতে আসা। এরপর তিনি ক্রমশ গণ-সংগীত রচনা শুরু করেন। অর্থাৎ এক স্বচ্ছল,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সংস্কৃতিমনস্ক পরিবার থেকেই সলিল চৌধুরীর গানের জগতে প্রবেশের সূত্রপাত। গানের কথা ও সুর এই দুটো বিষয়ে এতটা চিন্তাভাবনা হয়তো রবীন্দ্রনাথের পরে সেভাবে কাউকে পাওয়া যাবে না। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের পর সলিল চৌধুরীই বলিষ্ঠ সংগীত স্রষ্টা।

কমিউনিস্ট রাজনীতি বা গণনাট্যের প্রতি তাঁর আবেগ কাজ করলেও সংগীতের জন্যই সংগীত সৃষ্টিকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। গণনাট্য তাঁর অনুপ্রেরণা দিতে সাহায্য করেছে। তিনি গণসংগীত সম্পর্কে বলেছেন—গণসংগীতের সুর তেমনই হওয়া উচিত যার মাধ্যমে কথার আকুতি শ্রোতার কান অবধি পৌঁছোতে পারে। এর পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রোতারাই গণসংগীতের বোদ্ধা কেননা পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কিত ধারণা না থাকলে কর্ডের পরিবর্তন, হারমোনি প্রভৃতির পরিবর্তন বুঝতে পারবে না। এই গণসংগীতের সুর তাঁর নিজের সৃষ্টি। একটা নতুন ফর্ম, নতুন সুর গণসংগীতের প্রয়োজন। যদিও তিনি কৃষক, মজুরদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সোচ্চার করে তোলার দায়বদ্ধতা থেকে গণসংগীত লেখেন কিন্তু তার মধ্যে ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা। সন্দেশখালিতে এক কৃষক সম্মেলনে ভাটিয়ালি সুরে গাওয়া 'দেশ ভেসেছে বানের জলে, ধান গিয়েছে মরে/ কেমনে বলিব বন্ধু, প্রাণের কথা তোরে'- এই গানটিই প্রথম গণসংগীত। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮-১৯ বছর। অবশ্য নান্দকিকতার বিচারে এই গানটির কিছুটা উৎকৃষ্টের দিক থেকে ত্রুটি আছে। সলিল চৌধুরী তাঁর গানের সূচনাপর্বে লোকসুরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ক্রমশ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গণচেতনার গানগুলিতে এই দেশজ সুরের ব্যবহার কমে এসেছিল। ১৯৫১ সালে তিনি বোম্বের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলে গণনাট্যের ও গণসংগীতের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়ে যায়। এই বম্বেতে চলে যাওয়ার কারণ হিসেবে পার্টির প্রতি তিক্ততার সম্পর্ক একটি সাক্ষাৎকার উঠে এসেছে। সাক্ষাৎকারটি হল—

> "...পার্টির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদের কারণটা কী?
> — আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে আমি পলাতক। কিন্তু কোন্ অবস্থায় আমি পালাতে বাধ্য হয়েছি তা শুনলে যে কেউই পালাবে। বাবা মারা গেছেন, বিধবা মা, ছোটো ছোটো ভাইবোন নিয়ে দিনের পর দিন literally starve করছি। পার্টি থেকে একদিনের জন্য কেউ খোঁজ নিতে যায়নি আমি কী করে বেঁচে আছি। তখন 'পাশের বাড়ি', 'পরিবর্তন', 'বরযাত্রী' — এসব ছবিতে সুর দেওয়া হয়ে গেছে; 'গাঁয়ের বধূ', 'রানার', 'পালকি চলে' এসব রেকর্ড হয়ে গেছে। সেই সময় বিমল রায় জানালেন যে আমার 'রিক্সাওয়ালা' গল্পটা নিয়ে উনি হিন্দি ছবি করতে চান— 'দো বিঘা জমিন'। তখন তো আমার কাছে হাতে চাঁদ পাওয়া। নিছক বেঁচে থাকার জন্যই আমাকে বম্বে চলে যেতে হল।"[৬]

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৯৪১-৫১ এই দশ বছর মোটামুটি ভাবে সলিল চৌধুরীর গনচেতনার গানগুলি লেখা পরে এগুলি রেকর্ড আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এই দশ বছর সলিল চৌধুরী পুরোপুরি গণনাট্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর গানের মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য ও গণসংগীতকার হিসেবে জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। দেশভাগের মধ্য দিয়ে আসা স্বাধীনতা, কংগ্রেসের অরাজকতা এই সমস্ত দেখে সলিল চৌধুরী যথেষ্ট হতাশ হয়ে পড়েন ও নতুনভাবে দেশকে প্রেরণা দিতে গান লিখেছেন— 'ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি এখানে থেমো না/এ বালুরচরে আশার তরণী তোমার যেন বেঁধো না।', 'দেশ ভেসেছে বানের জলে, ধান গিয়েছে মরে।' এই ধরনের জাগরণের গান সলিল চৌধুরী আর অনেক লিখেছেন। যেমন— 'আলোর দেশ থেকে আঁধার পার হতে কে যেন ডাকে আমায়/ সে গানে প্রাণের কুসুমকলি তাই ফুটেছে নব মায়ায়।' তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গান— 'পথে এবার নামো সাথী/ পথেই হবে এ পথ চেনা।' এই গানটি তাঁর বোম্বে যাওয়ার পরে ১৯৫৪ সালে রেকর্ড করা। এই গানটি রেকর্ড করেছিলেন স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সলিল চৌধুরী যথার্থ টেকনিকের মধ্য দিয়ে গানকে উপস্থাপিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

গণসংগীতের উপস্থাপনেও সলিল চৌধুরী বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে সর্বদা সচেতন ছিলেন। কৃষক আন্দোলনের সময়ে গানগুলির মধ্যে ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তেভাগা আন্দোলনের জন্য তাঁর লেখা একটি অতি জনপ্রিয় গান হল— 'হেই সামালো ধান হো/ কাস্তেটা দাও শান হো।' তেলেঙ্গনা আন্দোলন প্রসঙ্গে লেখা তাঁর একটি গান— 'ও ভাই চাষি খেতের মজুর যতেক/ কিষাণ-কিষাণী (সজনী)/ এই বেলা নাও তেলেঙ্গনার পথের নিশানি।' আবার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রেকর্ড করা একটি জনপ্রিয় গান— "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে/ আয় রিমঝিম বরষার গগনে রে/ ...ক্ষুধার আগুন জ্বলে আহার মেলেনা!' সলিল চৌধুরীর বেশকিছু স্বদেশ সম্পর্কিত গানও রয়েছে। যেমন— 'নন্দিত নন্দিত দেশ আমার, দেশ আমার/ নিশি দিশি বন্দিত দেশ আমার, দেশ আমার।' এছাড়া 'মানব না এ বন্ধনে/ মানব না এ শৃঙ্খলে', 'এই দেশ এই দেশ/ আমার এই দেশ/... তোমার চরণধূলি দাও মা' প্রভৃতি গান আজও অমলিন হয়ে আছে। আবার কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ না করে প্রতিবাদমূলক গান—'আমার প্রতিবাদের ভাষা,/ আমার প্রতিরোধের আগুন,/ দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ দারুণ প্রতিশোধ।' দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পুলিশের হাতে কৃষক ও কৃষক রমণীদের মৃত্যুতে 'আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি' এই গানটি লিখেছিলেন। কবি সুকান্তের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন। সেটি হল— 'তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি/ ঘোর আঁধারের রাতে।/ ও দেশের বন্ধু শহীদ/ ঝড় বাদলের রাতে।'

স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসার পরে কংগ্রেসের আমলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলনের জন্যও সলিল চৌধুরী গান লেখেন ও সুর দেন। এই গানের একটি বিশেষত্ব হল গণসংগীতে সাধারণ কোনো পৌরাণিক ঘটনার উপস্থাপন করা হয় না, কিন্তু এখানে তিনি পৌরাণিক ঘটনার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে গানের মধ্যে কোথাও জড়তা বা আড়ষ্টতার সৃষ্টি হয়নি। এভাবেই তিনি গণসঙ্গীতের একটি নতুন ফর্ম বা আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছেন। গানটি হল — 'ভাঙো ভাঙো ভাঙো ভাঙো ভাঙো কারা/...ভাঙো ভীম পদাঘাতে ভাঙো, ভাঙা, ভাঙো/ ভাঙো ভাঙতে কারাগার।'

শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেও সলিল চৌধুরী বেশ কিছু গান লিখেছিলেন। তার মধ্যে সবথেকে বেশি জনপ্রিয় একটি গান, যা নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে ২৯ শে জুলাই, ১৯৪৬-এ সারা ভারতব্যাপী যে ধর্মঘট হয়, সেই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে লেখা— "শোষণের চাকা আর ঘুরবে না, ঘুরবে না/ চিমনিতে কালো ধোঁয়া উঠবে না, উঠবে না/...কেউ আজ হরতাল, আজ চাকা বন্ধ!/ ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে..." এছাড়াও সারা ভারত রেলওয়ে গ্যাংম্যানদের ধর্মঘট উপলক্ষে তাঁর একটি গান— 'এই সংগ্রাম দিয়েছে পুকার/ জাগো রেল মজদুর, জাগো জাগো। ...রেল মজুরের পেটে ভাত নাই রে! রেলমজুর ও রেলমজুর।' আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করেও সেই দাঙ্গা থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়ে একটি গান লেখেন— 'ও মোদের দেশবাসীরে/আয়রে পরাণ ভাই আয়রে রহিম ভাই/কালো নদীকে হবি পার।' এই গানে তিনি আসামের বিহুর সুর দিয়েছিলেন। যার ফলে গানের কথা ও সুর দুটোর মিশ্রণে এক অভূতপূর্ব উপস্থাপনা হয়ে উঠেছিল।

সলিল চৌধুরীর গানের মধ্যে কীভাবে বিষয়গত বৈচিত্র্য এসেছে তা উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম এবার আমরা স্বল্প পরিসরে তাঁর গানের কাঠামোগত কিছু বিশ্লেষণ করব।

সলিল চৌধুরীর কিছু গণসংগীত আছে যেগুলো অনেক গল্পের আকারে লেখা। এই গল্পের ধারা শেষ হলে অন্যান্য গানের মতো আর স্থায়ী অংশে গানটি ফেরে না। এ জাতীয় গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতা থেকে। এই কবিতাতে তিনি অসামান্য সুর দিয়েছিলেন। এই ধরনের আরও দুটি গান হল— 'গাঁয়ের বধূ', 'সেই মেয়ে'। 'গাঁয়ের বধূ' গানটিতে এক গ্রামের কথা আছে। ধানের ফলন খুব ভালো হওয়ায় সেই গ্রামের এক কৃষক বধূর আনন্দ ও সুখের অন্ত নেই। এই আনন্দের চিত্রটি দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পাল্টে যায় জোতদার, জমিদারের অকথ্য শোষণ ও অত্যাচারের ফলে সুখী গৃহকোণগুলি অন্ধকারে ডুবে যায়। এই প্রসঙ্গই গানটি স্তরে স্তরে ধ্বনিত হয়েছে। সলিল চৌধুরীর 'সেই মেয়ে' গানটিতে দেখব কালো হরিণ চোখের মেয়েটির লাবণ্য নেই। ক্ষুধার জ্বালায় সে জর্জরিত, শরীর তার জীর্ণ। সে অন্নের জন্য অপরের দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়ায়— এই হল গানের বিষয়বস্তু। এই কষ্টের বর্ণনার পরে তিনি গানটি আশার বাণীর মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন— 'পৌষালির মাঠে মাঠে/ সোনালি ফসল কাটে/গড়বেই নতুন জীবনের বাসা।' রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি' গানটি সুচিত্রা মিত্রকে জনপ্রিয় করে তোলে। এই গানের অনুষঙ্গেই সলিল চৌধুরীর 'সেই মেয়ে' এসেছে।

সলিল চৌধুরীর গান ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার নিয়মিত গাইত। পরবর্তীতে এরাই ২০০৭ সালে আশা অডিও থেকে 'আমাদের সলিলদা' নামে সলিল চৌধুরীর গণসংগীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার (Calcutta Youth Chorir, Set up in 1958) ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। তাদের শ্রোতারা চিরকালই শিক্ষিত নাগরিক। এদের কাছেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সলিল চৌধুরীর গান বেশি করে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার। সলিল চৌধুরী নিজেও 'ও আলোর পথযাত্রী', 'হেই সামালো', 'আর দূর নেই, দিগন্তের বেশি দূর নেই', 'আয়রে ও আয়রে', 'তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি' ইত্যাদি গানের গায়ক ও গানের বাদ্যযন্ত্র পরিবর্তন করে একাধিকবার রেকর্ড করেছেন। এই ধরনের গানের ক্ষেত্রে সুর, বাদ্যযন্ত্র পরিবর্তন করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই গানের ফর্মকে এক নতুন রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এই সংগীত পরিচালক, সুরকার, শিল্পীর গান তাঁর গানের জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নগরকেন্দ্রিক মানুষদেরই শ্রোতা হিসেবে পেয়েছেন।

গণসংগীতের ইতিহাসে সলিল চৌধুরী প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গণনাট্যের সূচনা পর্বে তিনি মূলত প্রশিক্ষণ দিতেন, গান শেখাতেন, তিনি হলেন বিনয় রায়। অবশ্য তাঁর নিজের লেখা গানের সংখ্যা কম। বিনয় রায়ের পাশে থাকতেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তাঁকে সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিতা মিত্র প্রমুখরা সকলে বটুকদা নামে ডাকতেন। সলিল চৌধুরী গণচেতনার গানে নতুন ফর্মের সন্ধানকারী একজন সফল ব্যক্তিত্ব। নতুনভাব, নতুন পরিকল্পনা, নতুন কথা, নতুন সুর চাইছিলেন সেদিনের বাংলার মানুষ। তাদের এই চিন্তা ভাবনাকেই বাস্তবায়িত করেন সলিল চৌধুরী। বহুমুখী প্রতিভার জন্যই তিনি যেমন গণনাট্যের জন্য গণসংগীত রচনা করতে পারেন, তেমনি তিনি লিখতে পারেন অসংখ্য প্রেমের গান, শৈশব সংগীতও রচনা করতে পারেন। সত্তর-আশির দশক পর্যন্ত 'হলুদ গাঁদার ফুল দে এনে দে', 'প্রজাপতি প্রজাপতি' প্রভৃতি গানগুলি সলিল চৌধুরীকে শৈশব সংগীত রচয়িতার মর্যাদা দিয়েছে। এছাড়াও 'বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে', 'এক যে ছিল মাছি', 'ও আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে', 'কেউ কখনো ঠিক দুপুরে', 'খুকুমণি গো সোনা', 'হবু চন্দ্র রাজা', 'ছিছি রানি রাঁধতে শেখেনি'- র মতো অসংখ্য গানগুলিকে প্রাণদান করেছেন।

কবি হিসেবে পরিচিত কিন্তু গীতিকারে ভূমিকা নিয়ে সংগীত জগতে পৌঁছেছেন এই ঘরানার শেষ কবি নজরুল ইসলাম। নজরুলের পরেই বাঙালি গীতিকারেরা গীত রচনার একটি আলাদা ঘরানা তৈরি করে নেন। অবশ্য এই ধারণাটিও এসেছিল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই। সলিল চৌধুরীর কোনোদিনই কোনো কবিতা লিখতে চাননি। আবার প্রথাগত গীতিকার হওয়ার সেভাবে কোন ইচ্ছেও ছিল না। আসলে প্রতিভাবান শিল্পীরা চিরাচরিত প্রথাকে ভেঙে এক নতুন রূপ দিতে চান। এর মধ্যে দিয়েই তাঁরা হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র। সলিল চৌধুরীর ক্ষেত্রও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি যখন কাব্যজগতে আসেন তখন বাংলা কাব্যজগতে শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মত শক্তিমান কবিরা পদার্পণ করেছেন। সলিল চৌধুরীর সঙ্গে তাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অন্যধারায় কবিতা লিখেছেন। অন্যদিকে অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায় প্রমুখের ধারাতেও গান রচনা করেননি। তাঁদের ব্যবহৃত স্থায়ী, অন্তরার রীতিকেও অস্বীকার করলেন। মাত্রাগত প্রয়োজনে কখনো সাধু কখনো চলতি কখনো আবার লৌকিক শব্দ ব্যবহার করলেন। এছাড়াও তিনি বিষয় অনুযায়ী গানের শব্দও প্রয়োগ করেছেন। তার শব্দের মধ্যে 'চোখ', 'পাখি' ইত্যাদি রোমান্স ধর্মী শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও এই জাতীয় শব্দের মধ্য দিয়ে জীবনের চলমানতা ও একাকিত্বের দিকটিও ফুটে উঠেছে।

ছোট-ছোট সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর গানের ভাষাকে সর্বকালের সমগ্র মানবজাতির প্রতিভূ করে তুলেছেন। গানের ভাষা ও কবিতার ভাষা যে এক নয় কোথাও দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে এটা সলিল চৌধুরী বারংবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। সলিল চৌধুরী ভাবে-ভাষায় অনেক বেশি আধুনিক মনস্ক। এখানেই তিনি একজন কবি, সংগীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, গণসংগীত প্রণেতা হিসেবে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, রত্না, 'গণসংগীত', ঘোষ প্রদীপকুমার (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা ৬, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬

২. সেনগুপ্ত, দিলীপ, 'গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা গানের ধারা : একটি সমীক্ষা', ঘোষ প্রদীপকুমার (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা ৭, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২২৪

৩. বিশ্বাস, হেমাঙ্গ, 'সত্তর দশক ও গণসংগীত', আচার্য অনিল (সম্পাদিত), সত্তর দশক, খণ্ড দুই, 'অনুষ্টুপ',

কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৭০

৪. রোবসন, পল্, 'যে পথে দাঁড়িয়ে', চক্রবর্তী দীপেন্দু, 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৮৯

৫. দাস, সুখেন্দু, 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা— বাংলা বিশেষ সংখ্যা', কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৮

৬. গুপ্ত, সমীরকুমার, 'সলিল চৌধুরী প্রথম জীবন ও গণসঙ্গীত', মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬